

বিশ্ব কৃষির নেতৃত্বে বাংলাদেশ

● আলতার হোসেন

ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে ওঠে এসেছে। এর মধ্যে পাট রপ্তানিতে বিশ্বে প্রথম বাংলাদেশ। ইলিশ মাছ উৎপাদনে প্রথম, সবজিতে তৃতীয়, মিঠাপানির মাছে তৃতীয়, আম উৎপাদনে বিশ্বে নবম বাংলাদেশ। আলু উৎপাদনে শীর্ষ দশে বাংলাদেশ। ইলিশ উৎপাদনে প্রথম বাংলাদেশ। র‍্যাক বেসল ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ। আর ছাগলের দুধ উৎপাদনে দ্বিতীয়, পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম, কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং জলবায়ু সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনে শীর্ষে বাংলাদেশ। কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, হেক্টরপ্রতি উৎপাদনের দিক থেকেও অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। কৃষি উৎপাদনে

বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হচ্ছে ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার টন

আউশ হয় ৭০ হাজার টন, বোরো থেকে আসে দুই কোটি ১০ লাখ টন, গম উৎপাদন হয় ১২ লাখ টনের বেশি। এ ছাড়া ভুট্টা উৎপাদন হয় ৫০ লাখ টনের বেশি। দেশে বছরে সাড়ে চার কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে। এর মধ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনে শীর্ষে বাংলাদেশ। কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, হেক্টরপ্রতি উৎপাদনের দিক থেকেও অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের দিক থেকেও

কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে ঋণসম্পূর্ণতা ধরে রাখা, চালসহ কৃষিপণ্য, প্রক্রিয়াজাত মাছ-মাংস রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একের পর এক স্বীকৃতি পাচ্ছে বাংলাদেশ। খাদ্য উৎপাদনে ঋণসম্পূর্ণ বাংলাদেশ। ধান, গম, ভুট্টা আলু, আম বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে জামাই এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সবজি উৎপাদনে তৃতীয় আর মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও ঘর্ষণসহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিজমি কমতে থাকাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্ব উদাহরণ। দেশের খোরপোশ কৃষি এখন বাণিজ্যিক কৃষিতে উন্নীত হয়েছে। জিডিপিতে এখন কৃষির অবদান ৪ শতাংশ। কৃষিতে দেশের ৪০ শতাংশ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে।



বাংলাদেশের সাফল্য ঈশ্বরীয়। অল্প সময়ে বাংলাদেশ কি করে কৃষিতে এত সফলতা অর্জন করেছে, বিশ্ব তা বাংলাদেশের কাছ থেকে শিখতে চায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কলাকৌশল শিখাতে এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বের ১৯৪টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধির অংশগ্রহণে বাংলাদেশ ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত মেয়াদে সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ কাউন্সিলের নীতি ও নির্বাহী পর্যায়ে এফএও'র কার্যক্রম, বাজেট বাস্তবায়ন, ফলাফলভিত্তিক কার্যক্রমের আওতাধীন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ এর প্রশাসনিক দিকগুলো তদারকিতে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নেতৃত্ব দেবে এবার বাংলাদেশ। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা- যা ক্ষুধা দূরীকরণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে।

মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং অব্যাহত পরে প্রায় সাত কোটি মানুষের খাদ্য উৎপাদন করতেই হিমালয় খেতে হয়েছে দেশকে। তখন আমদানি করে চাউনটা মেটাতে হতো। অর্থাৎ এখন দেশের লোকসংখ্যা তিনগুণের কাছাকাছি। পাশাপাশি প্রতিদিন আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে ২০ শতাংশ করে। এরপরও আমন, আউশ ও বোরো ধানের বাম্পার ফলনে বছরে প্রায় সাড়ে চার কোটি টনের বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের খাদ্য সংকটকে হ্রাস করে সাববে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিন্জার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ একটি 'তলাবিহীন বুড়ি' বলে মন্তব্য করেছিলেন। বাংলাদেশ এখন আর খাদ্য সংকটের দেশ নয়। বাংলাদেশ এখন চাল-সবজিসহ খাদ্যপণ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ২০ শতাংশ প্রগোদনা দেওয়া হচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও অফ্রিকার বিভিন্ন দেশসহ ১৪৪টি দেশে বাংলাদেশি কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে ১০.৩ কোটি ডলার আয় এসেছে। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯ শতাংশের বেশি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের ধানের উৎপাদন তিন গুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ সবজি পাঁচ গুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে ১০ গুণ। দুই যুগ আগেও দেশের অর্ধেক এলাকায় একটি ও বাকি এলাকায় দুটি ফসল হতো। বর্তমানে দেশে বছরে গড়ে তিনটি ফসল হচ্ছে। পরিশ্রমী কৃষক ও কৃষি উৎপাদনে শীর্ষ প্রয়াসে এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতার পর যৌথ হেক্টর জমিতে দুই টন ধান উৎপাদিত হতো। এখন হেক্টর প্রতি উৎপাদন হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় টনেরও বেশি। হিসাব করলে তা ছয় টন আর এভাবেই প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি, উন্নত জাতের জাতের ব্যবহার ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার ফলে দেশে ১৯৭১ সালের তুলনায় বর্তমানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে আমন থেকে উৎপাদন হয় দেড় লাখ টন,

বাংলাদেশ এখন বিশ্ব উদাহরণ। কৃষি হচ্ছে আমাদের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক খাত, এ খাত থেকে জিডিপির ১৩.২৯ শতাংশ আসে। কৃষিতে দেশের ৪০ শতাংশ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। মৌসুমে কৃষি শ্রমিকের সংকট ও মজুরি বৃদ্ধি আছে। এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ফসলচাষে যান্ত্রিকীকরণ শুরু হয়েছে। এ জন্য কৃষকদের ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ প্রগোদনা দেওয়া হচ্ছে। যান্ত্রিকীকরণ বাড়াতে তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ছে। জলবায়ু সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে ব্রি এবং বিনা। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। ধান-সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উপযোগী উর্বর মাটির দেশ। তা সত্ত্বে প্রাচীন প্রকৃতিতে চাষাবাদের কারণে সব সময় খাদ্য ঘাটতি ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেশের প্রথম অর্থবছরের ৭৮০ কোটি টাকার বাজেটে কৃষি খাতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন। আধুনিক কৃষি গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। জাতের ধানের বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক কৃষির বিভিন্ন উপকরণ সহজলভ্য করেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কৃষি উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হয়। স্নেহাচারি সরকারের সময় কৃষির গুরুত্ব কমে যায়। আশানুরূপ উৎপাদন হয়নি। ২০০৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ জাতিকে প্রতিশ্রুতি দেয়, খাদ্য শস্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমিয়ে আনা হবে। আজকে আমরা দেখছি, ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে ওঠে এসেছে। এর মধ্যে পাট রপ্তানিতে বিশ্বে প্রথম বাংলাদেশ। সবজিতে তৃতীয়, মিঠাপানির মাছে তৃতীয়, আম উৎপাদনে বিশ্বে নবম বাংলাদেশ। আলু উৎপাদনে শীর্ষ দশে বাংলাদেশ। ইলিশ উৎপাদনে প্রথম বাংলাদেশ। র‍্যাক বেসল ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ। আর ছাগলের দুধ উৎপাদনে দ্বিতীয়, পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম, কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং জলবায়ু সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনে শীর্ষে বাংলাদেশ। কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, হেক্টরপ্রতি উৎপাদনের দিক থেকেও অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। সরকারের ধারাবাহিকতায় কৃষিকে গুরুত্ব আশ্রয় করায় এ অর্জন হয়েছে। এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকায় বিশ্বে কৃষিতে ১১ খাতে সেরা বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং মার্কিন কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) স্বীকৃতি দিয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য বিশাল এক অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন বিশিষ্টজনরা।

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণার জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার তথ্য মতে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। এক সময় দেশের



মধ্য ও উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোরেরি কেবল সবজির চাষ হতো। এখন দেশের প্রায় সব এলাকায় সারা বছরই সবজির চাষ হচ্ছে। দেশে সবজির উৎপাদন যেমন বেড়েছে, ভোগও তেমনি বেড়েছে। দেশে মাথাপিছু সবজির ভোগ বেড়েছে প্রায় ২.৫ শতাংশ। পাশাপাশি সবজি রপ্তানি করেও মিলাছে বৈদেশিক মুদ্রা। এক সময় 'মাছে-ভাতে বাঙালি' কথাটি বইয়ের মতোই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা বাস্তব। মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। এফএও পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে প্রথম দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্বে মোট আম উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায়। ফলটির উৎপাদনে শীর্ষ দশে রয়েছে বাংলাদেশের নাম। প্রায় সাড়ে নয় লাখ টন আম উৎপাদনের মাধ্যমে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে কৃষি ও খাদ্য সংস্থার (এফএও) সর্বশেষ মূল্যায়নে বলা হয়েছে। আলু উৎপাদন সাফল্যের এক বিষয়। এক দশক আগেও উৎপাদন ছিল অর্ধালাফ টনের নিচে। বর্তমানে দেশে দেড় কোটি টন আলু উৎপাদন হচ্ছে। আলু বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। দানাদার খাদ্যে ঋণসম্পূর্ণ বাংলাদেশ। এখন নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার। পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। গত ১২ বছরে সবজির উৎপাদন বেড়েছে সাত গুণ। বর্তমানে এক কোটি ৯৭ লাখ টন সবজি উৎপাদন করে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সবজি রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে অসংখ্য। অচিরেই সবজি রপ্তানি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎসে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

পানির দূষণাপ্রত্যায় বাড়ছে কৃষকের সেচ খরচ

● ইন্দরান ঘিনিকি

পানির অপচয় নাম জীবন। খাবার পানি, রন্ধন, গোসল, স্নেহসহ সব কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল বাংলাদেশ। সুপেয় ও চাষাবাদের পানির চাহিদার প্রায় ৮০ শতাংশই ব্যবহার হয় ভূগর্ভস্থ স্তর থেকে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের মানুষ সুপেয় পানির উন্নত সঙ্কটে পড়ছেন। বাংলাদেশে আদম চাষ সম্পূর্ণ বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। এখন কোনো কোনো বর্ষা বর্ষা বর্ষায় বৃষ্টির দেখা মিলে না। ফেটে চৌচির হয় ফসলের মাঠ। দেশে আদম মৌসুম ডিজেল চালিত ১৭ লাখ শ্যালো টিউবওয়েল মাটির নিচে থেকে পানি তুলে। এগুলো ২০ থেকে ২৪ ফুট মাটির নিচে থেকে পানি তুলতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে অনেক এলাকায় মাটির ৩০ ফুট নিচেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। পানির এ দূষণপ্রত্যায় বেড়ে যাচ্ছে কৃষকের সেচ খরচ।

কৃষিবিন আদম সালমা বলেন, দেশের মূলত মধ্যভাগ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত ৩১ জেলার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর প্রতি বছরই একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নিচের দিকে নামে যাচ্ছে। পানির স্তর এক ফুট নিচে চলে গেলে কৃষকদের বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়। এক ফুট বেশি দেবেগেলে বেশি হর্সপাওয়ারের সেচ পাশ দরকার হয়। এতে জ্বালানি

এক কেজি ধান উৎপাদনে ব্যয় হয়
প্রায় দেড় হাজার লিটার পানি

তেল বা বিদ্যুৎ বেশি প্রয়োজন হয়। ১৯৬৮ সালে যখন বাংলাদেশে ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়, তখন সর্বোচ্চ ৫০ ফুট নিচে বসানো হতো। এখন ১৫০ ফুট নিচে বসানো হলেও পানি মিলছে না। বোরো মৌসুমে এক কেজি ধান উৎপাদনে দেড় হাজার লিটার পানির প্রয়োজন হয়। এ পানির জোগান আসে ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে। সেক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় নিচে নামে যাচ্ছে পানির স্তর। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ওধু বোরো উৎপাদনে সেচব্যবন নয় হাজার ৮৭ কোটি টাকার জ্বালানি ব্যয় হচ্ছে। এতে বাড়ছে কৃষকের উৎপাদন ব্যয়। দেশের কৃষক সেচের পেছনে যেটা উৎপাদন ব্যয়ের ৬৫ শতাংশ অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। ধান উৎপাদনে এ খরচ বিশ্ব সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, ধান উৎপাদন পানি প্রয়োজনের বিষয়ে ১৯৫২-১৬ এবং ২০১৬-১৭ সালের তথ্য পর্যালোচনা করেছে। সেখানে দেখা গেছে, ধান উৎপাদনে সর্বোচ্চ গড় ১

হাজার ৩০০ এবং সর্বনিম্ন ১ হাজার ২০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৮০-৮১ সালে এক কেজি ধান উৎপাদনে সেচের পানির প্রয়োজন হতো ৮ হাজার লিটার। এরপর ২০০৬-০৭ সালে তা কমে ৩ হাজার লিটারে দাঁড়ায়। সর্বশেষ তা দেড় হাজার লিটারে গুঁড়ে। প্রতি বছরই ধান উৎপাদনে পানির ব্যয় বাড়ছে। বিশেষ করে হাইব্রিড ধানের ব্যবহার বাড়ায় পানির প্রয়োজন বাড়ছে। কৃষকরাও ভালো ফলনের আশায় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপ্রোগ্রাম-বিএডিসির হিসাবে, বর্তমানে দেশে কৃষিকাজে ব্যবহার করা পাশ্প আছে ১৩ লাখ ৭৯ হাজার ৩০টি। এর মধ্যে ডিজেল চালিত ১১ লাখ ৯২ হাজার ৬০০টি। বিন্যুতে চলে মাত্র ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪০০টি। অগভীর নলকূপ বিন্যুতে চলে ১ লাখ ৫০ হাজার। ডিজেল চলে ১০ লাখ ৭০ হাজার। গভীর নলকূপের মধ্যে ১২ হাজার ডিজেল এবং ২৬ হাজার বিন্যুতে চলে। বোরো মৌসুমে ১৭ লাখ শ্যালো টিউবওয়েল কার্যকর থাকে। কৃষিবিন ডাউর আকবর হোসেন বলেন, ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে, বাড়াতে হবে সেচ দক্ষতা। সে সঙ্গে পানির উৎস তৈরি করতে হবে। নদী-নালা খনন ও বড় বড় জলাশয় তৈরি করতে হবে। যত্রতত্র পানি ব্যবহারের ফলে কৃষকের সেচ খরচ বাড়ছে। পানি কম লাগে এমন জায়গে উদ্ভাবন করতে হবে। পানি ধরে না রাখতে পারলে আগামীতে উন্নয়ন সেচ সঙ্কটের মুখে পড়বে বাংলাদেশ। আউশ ও আদম ধানের উৎপাদনে সরকারকে জোর দিতে হবে। এ দুটি ফসল উৎপাদন খরচ কম। বৃষ্টির পানিতে আবাদ করা যায়। অথচ বোরো ধান আবাদে নিয়মিত সেচ দিতে গিয়ে ভূগর্ভস্থ পানির সঙ্কটে পড়ছে দেশ। সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় নিচে নামে যাচ্ছে পানির স্তর। সেচ পাশ্পের মাধ্যমে সেচের পানি তুলতে গিয়ে চাপ পড়ছে বিন্যু ও জ্বালানি খেলের ওপর। হাজার কোটি টাকার জ্বালানি ব্যয় হচ্ছে। এতে বাড়ছে কৃষকের উৎপাদন ব্যয়। এ দেশের কৃষক সেচের পেছনে যেটা উৎপাদন ব্যয়ের ৬২ শতাংশ অর্থ খরচ করে থাকেন। উন্নয়ন হচ্ছে



ভূগর্ভস্থ পানির সঙ্কট, নিচে নামে যাচ্ছে পানির স্তর। ফসল চাষকে লাভজনক করতে প্রকৃতিবিরুদ্ধ আদম ও আউশ উৎপাদনে জোর দিতে হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট রির এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বোরো ধান চাষে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নিচে নামছে। এতে এক কেজি বোরো ধান উৎপাদনে প্রায় এক হাজার থেকে এক হাজার ৬০০ লিটার সেচের পানির দরকার হয়। বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে সুপেয় খাবার পানি অত্যন্ত দূষণাণ। গ্রীষ্মের শুরুতে বরেন্দ্র অঞ্চলের গ্রামগুলোতে খাবার পানির সঙ্কটে বাস্তু হয় জনজীবন। ক্রমেই পানি সঙ্কটপন্ন হয়ে উঠছে বরেন্দ্র অঞ্চল। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার অধিকাংশ এলাকা এবং নাটোরসহ বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার কয়েকটি এলাকা জুড়ে বরেন্দ্র অঞ্চল অবস্থিত। সুপেয় খাবার পানি নিয়ে সংঘাতে প্রাথমিকভাবে হয়েছে একাধিকবার। পানি পেয়ে এলাকা ছাড়ছে বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষ। পানি বিশেষজ্ঞ ব্যুয়েটের অধ্যাপক ড. অমিনুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বর্ষাপের অন্যতম। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উন্নয়ন সেচের পানি সঙ্কটে পড়ছে বাংলাদেশ। কয়েক বছর ধরে ওধু মৌসুমের শুরুতেই সারাদেশে কৃষি কাজে ব্যবহৃত প্রায় আড়াই লাখ শ্যালো টিউবওয়েলে সেচের পানি গুঁড়ে না ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নামে যাওয়ার কারণে। ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যালান অন স্ট্রাইমেটেড চ্যঞ্জের (আইপিসিসি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ু

প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘন ঘন আঘাত হচ্ছে। ফলে লবণাক্ততা বেড়ে নষ্ট হচ্ছে নিষ্টি পানির আধার। খুলনার উপকূলীয় উপজেলা নাকোপ, করণা, বাগেরহাটের মোলা, শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জ, সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও আশাচর্চি এলাকায় সুপেয় পানি প্রায় দূষণাণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানি এখন সীমাবদ্ধ হরণ। দেশের প্রতিক্রি জন্গাণী, উপকূল, পার্বত্য এলাকা, হাওরঞ্চল, বরেন্দ্র এলাকা, চা বাগান ও দুর্গম এলাকায় নির্যাপন সুপেয় পানির ব্যাপক সঙ্কটে রয়েছে। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি)-এর সঙ্গী অন্তর্ভুক্তি, বাংলাদেশে মাত্র ৫৬ শতাংশ মানুষ সুপেয় পানি পাচ্ছেন। জাতিসংঘ পানি অধিকারকে মানবিকতার হিসেবে ঘোষণা করেছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও এশীয়-প্রশস্ত পানি ফোরাম 'ন্য এশিয়ান ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট অউটলুক' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে পানি সঙ্কটে ভয়াবহ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪৯টি দেশের মধ্যে ৩৭টি দেশেই পানি সঙ্কটে রয়েছে। এর মধ্যে সুপেয় পানির সঙ্কটে ভয়াবহ রূপ পেতে চলেছে বাংলাদেশ, ভারত, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও কম্বোডিয়ায়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপ্রোগ্রামের (বিএডিসি) 'গ্রেডেড ওয়াটার জেনিট মাপ' অনুযায়ী- গত কয়েক বছরে দেশের ৪১ জেলার ১৯২ উপজেলায় দেখা দিয়েছে সেচের পানি সঙ্কট। দেশের অধিকাংশ

এলাকায়ই তরু হয়েছে মরুভূমি প্রক্রিয়া। মরুরি সেচ প্রকল্প, জিকে প্রকল্প, বরেন্দ্র সেচ প্রকল্প এবং মেঘনা-ধনাগোনা সেচ প্রকল্প বন্ধ হওয়ার পাখে। রংপুর, রাজশাহী, খুলনা অঞ্চলেও সেচের পানির উন্নত সঙ্কটে দেখা দিয়েছে। হাংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহীতে পানির স্তর গড়ে ২০ থেকে ২৫ মিটার পর্যন্ত নামে গেছে। ময়মনসিংহ, গাজীপুর, নারসিংদী ও ঢাকার আশপাশের এলাকায় পানির স্তর নামে গেছে প্রায় ২৫ ফুট। সবচেয়ে বেশি নামেছে রাজশাহী ও নওগাঁ জেলায়। বিশ্বব্যাংকের পানি বিষয়ক গবেষক ড. ইচ্ছাৎবাহারজামান বলেন, বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে আগামী ৮০ বছরের মধ্যেই গলে যাবে হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বতমালায় বরফ দুই তৃতীয়াংশ গলে যাবে। দুই পর্বতমালায় হিমবাহগুলো অস্তিত্ব আটটি দেশের পানির প্রধান উৎস। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে হিমবাহ গলে গেলে চরম বৃষ্টির মুখে পড়তে পারে এ অঞ্চলের দুইশো কোটিরও বেশি মানুষ। কেউ কেউ আগামী দিনে পানি নিয়ে বিস্ময়ের আশঙ্কাও করেন। বিশেষ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০২০ সালেই বিশ্বের প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মানুষ পানির স্বল্পতার শিকার হয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ পানির অভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাববিক্ষিপ্ত এশিয়ায় ধান ও ভূট্টার ফসল দশ শতাংশ কমে যাবে। পানির অভাবে এই অঞ্চলের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলবে। ছিয়েতনাম ও পাকিস্তানে ইতোমধ্যে শসসার উৎপাদন ৩০ শতাংশ কমে গেছে।



কালের বর্গ

তারিখ: ১৫-০৬-২০২৪ (পৃষ্ঠা: ০৬)

নতুন জাতের ধান ও আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়



জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস

বহুবর্ষজীবী বা মুড়িজাতীয় ধানের জন্য শুধু জাতটিই নয়, পরিবেশ ও পরিচর্যা সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে মুড়ি ধান করতে হলে বন্যামুক্ত জমি দরকার। আর পঞ্চরীতির জন্য দরকার শীত-গ্রীষ্মের অতিরিক্ত প্রভাবমুক্ত পরিবেশ, যেখানে সারা বছর ধান করা যায়



ধান কেটে নেওয়ার পর বিশেষ কিছু জাতের গোড়া থেকে গজানো কুশিকে মুড়ি ধান (Ratoon rice) বলে। এই মুড়ি ধান সংরক্ষণ করলে জাত ও পরিচর্যাভেদে ৪০ থেকে ৭৫ দিনের মধ্যে আবার কিছু ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুড়ি ধান লাভজনক না হওয়ায় কৃষকরা এটিকে গুরুত্ব দেন না। তবে পৃথিবীর অনেক দেশের কৃষকরা মুড়ি ধানকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যেমন ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কৃষকরা মুড়ি ধানের আবাদ করে থাকেন, কিন্তু ফলন আশাপ্রদ নয়। ২০০৭ সালে স্থানীয় ধানবিজ্ঞানী এর্দিনানের নজরে আসে বিষয়টি। তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর গতানুগতিক মুড়ি ধান পরিচর্যাপদ্ধতিতে একটি পরিবর্তন আনেন। তিনি ধানের গোছা মাটি থেকে ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার ওপরে না কেটে মাটি সমান করে কাটেন। জমিতে গতানুগতিক পদ্ধতিতে পানি জমিয়ে না রেখে শুধু ভেজা ভেজা রেখে দেন। এতে শক্ত এবং পুষ্ট কৃষি বের হয়। তারপর প্রধান ফসল থেকে কম সময়ে দ্বিতীয় ফসল (প্রথম মুড়ি) কাটা সম্ভব হয়। এই দ্বিতীয় ফসল থেকে

একই পদ্ধতিতে তৃতীয় ফসল (দ্বিতীয় মুড়ি) করা হয়। এভাবে একবার রোপণ করে বছরে সাতবার পর্যন্ত ধান কাটা সম্ভব হয়। প্রতিবারে গতানুগতিক মুড়িপদ্ধতির চেয়ে তুলনামূলক ভালো ফলন পাওয়া যায়। এখন পশ্চিম সুমাত্রার চাঘিরা এর্দিনানের দেখানো পথে মুড়ি ধানের চাষ করছেন। ওখানে প্রযুক্তিটি SALIBU নামে পরিচিত। JIRCAS-এর সহায়তায় জাপানি বিজ্ঞানীরা ঐতিহ্যবাহী SALIBU প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ইন্দোনেশিয়া ছাড়াও মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে কাজ করেছেন।

ইদানীং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জিনবিজ্ঞানী ড. আবদ চৌধুরী উজ্বিত এই ধরনের একটি ধানের জাত নিয়ে বেশ আলাপ-আলোচনা চলছে। বোরো মৌসুমে রোপণের ১১০ দিন পর জাতটির প্রথম ফসল কাটা পড়ে। এরপর ধানগাছের গোড়া থেকে কুশি গজানোর ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর আবার কিছু ধান পাওয়া যায়। সাধারণ মুড়ি ধানের দৌড় এ পর্যন্তই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উজ্বিতের দাবি মোতাবেক বোরোর (হেক্টরপ্রতি ফলন চার টন) পরে আউশ দুইবার (তিন টন + দুই টন) এবং আমনে দুইবার (দুই টন + দুই টন) বছরে মোট পাঁচবার ধান পাওয়া সম্ভব। মুড়ি ধান নিয়ে আমাদের উপমহাদেশে ১৯৫০ সাল থেকে গবেষণা হচ্ছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটেও (ব্রি) বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) ১৯৮০-এর দশকের আগে-পরে মুড়ি ধান নিয়ে বেশ কিছু কাজ করে, কিন্তু ফলপ্রসূ কিছু করা যায়নি। অতঃপর ইরির বিজ্ঞানী ক্যালোডাসিয়ন ও তাঁর সহযোগীরা (১৯৯২) গতানুগতিক মুড়ি-প্রযুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে লক-লজিং নামের এক বিশেষ কৌশল উদ্ভাবন করেন। এই প্রযুক্তির ব্যবহারে গতানুগতিক পদ্ধতির চেয়ে প্রায় দুই গুণ ফলন বেশি পাওয়া গেলেও ফিলিপাইনের চাঘিরা সেটি গ্রহণ করেননি। এর পরপরই (উন্নততর মুড়ি-প্রযুক্তির লক্ষ্যে) বহুবর্ষজীবী ধান নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ইরির বিজ্ঞানীরা (স্যাক ও তাঁর সহযোগীরা, ২০০৬)। তাঁরা জর্ফি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত কন্দপমূত্র (Rhizomatous) জর্ফি ধানের জাতের (Oryza longistaminata) সঙ্গে Oryza sativa-এর সংকরীকরণের ফলে উদ্ভূত প্রজন্ম নিয়ে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন। উল্লেখ্য, মুড়ি ধান এবং বহুবর্ষজীবী ধানের মধ্যে কৌলিতাত্ত্বিক ও কৃষিতাত্ত্বিক ভিন্নতা আছে। বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পরে ২০০১ সালে বাজেট স্বল্পতার অভ্রুহাতে এই গবেষণা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চীনা বিজ্ঞানী হু ফেদুই (বর্তমানে জুনান একাডেমি অব আগ্রিকালচারাল সায়েন্সের উপপরিচালক) দেশে

ফিরে এই কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ও তাঁর সহযোগী Oryza longistaminata-এর সঙ্গে স্থানীয় উফশী জাতের সংকরী করে কিছু কৌলিক সারি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। এসব কৌলিক সারি থেকে উদ্ভাবিত তাঁদের কিছু জাত এখন কৃষকরা চাষ করছেন। তাঁরা কন্দ-বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিনগুচ্ছ শনাক্ত করতে সক্ষম হন। তাঁদের এ কাজ এখনো চলমান। বিশ্বের অনেক দেশে তাঁরা তাঁদের প্রযুক্তি সম্প্রসারণের চেষ্টা করছেন। জুনান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (IUBAT- International University of Business Agriculture and Technology) কয়েক বছর ধরে বহুবর্ষজীবী ধান নিয়ে কাজ করছে। এসব গবেষণার ফলাফল দেখে আমার মনে হয়েছে যে বহুবর্ষজীবী বা মুড়িজাতীয় ধানের জন্য শুধু জাতটিই নয়, পরিবেশ ও পরিচর্যা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমাদের দেশে ড. চৌধুরী উজ্বিত উপযুক্ত মুড়ি-প্রযুক্তি বা পঞ্চরীতি ধান নিয়ে অনেকেই খুব আশাবাদী। এ ব্যাপারে তিনি কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনার দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এই প্রযুক্তির ব্যবহার উপযোগীতা প্রমাণের জন্য তাঁর প্রথমেই উচিত ছিল ব্রিটে একটি সেমিনার দেওয়া। তাহলে এই প্রযুক্তির প্রায়োগিক দিকগুলো পরিষ্কার হতো। কারণ কোনো কৌলিক সারি উদ্ভাবন করলেই চল না। কৃষকের উপযোগী করতে হলে কৃষকবান্ধব, পরিবেশবান্ধব, ব্যাসাশ্রয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবনটি 'যুক্তিহীন-উদ্ভাবন' (Rational invention) হতে হবে। তবেই না সেটি জাত হিসেবে অবমোচন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে ব্রিট পক্ষ থেকে আগ্রহের কমতি ছিল না, কিন্তু ড. চৌধুরীর পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। অতএব তাঁর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি নিয়ে সম্প্রদায়ের উদ্বেগ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বছর আটেক আগে (সম্ভবত ২০১৭ সালে) কানিহাট-১, কানিহাট-২, কানিহাট-৩ (কানিহাট সিরিজ) ইত্যাদি কিছু বোরো ধানের কৌলিক সারি উদ্ভাবনের নামে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর দাবি মোতাবেক জাতগুলো ছিল মাত্র ১২০ দিনের। তাহলে হাওরে রোপণ করলে নিশ্চিত বৈশাখী ঢলের আগে আগে কাটা পড়ার কথা। বাংলাদেশের ধানবিজ্ঞানীরা সেই ১৯৩৪ থেকে চেষ্টা করে আসছেন একটি স্বল্পজীবনকালীন বোরো ধানের জাত আবিষ্কারের। পারেননি। অবশেষে ১৯৯৪ সাল ও তার পরের কিছু উদ্ভাবিত উফশী জাত; যেমন-ত্রি ধান২৮, ত্রি ধান৩৬, ত্রি ধান ৪৫, যাদের জীবনকাল ১৪০ দিন বা অল্প কিছু বেশি। ২০১৭ সালের পরে অবমুক্তকৃত কিছু জাতের জীবনকাল ত্রি ধান২৮-এর মতো হলেও ফলন হেক্টরপ্রতি এক থেকে দেড় টন

বেশি। ঠিক এমনই সময় মন্ত্রণালয় থেকে কানিহাট সিরিজের কৌলিক সারিগুলোর ফলন পরীক্ষা করার আদেশ আসে। ব্রি যথারীতি আদেশ পালন করে। দুঃখের বিষয়, ওই পরীক্ষা কার্যক্রমে কানিহাট নামের কৌলিক সারিগুলো থেকে আশানুরূপ কোনো ফল পাওয়া যায়নি। এমনকি দাবিকৃত জীবনকাল সম্পর্কেও না। কারণ জানুয়ারিতে রোপণ করা (তখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত) জাতগুলোর জীবনকাল কোনোক্রমেই ১৪০ দিনের নিচে আসার কথা নয়। তবে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে (দেরিতে রোপণ) রোপণ করলে জীবনকাল কমে এলেও মে মাসের শেষে ধান কাটা পড়বে; ফলন কমে যাবে। অর্থাৎ অন্য জায়গায় কিছু ফলন পাওয়া গেলেও হাওরের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। তাই ব্রি বিজ্ঞানীরা কানিহাট সিরিজের কৌলিক সারিগুলোর পক্ষে দাবিকৃত ফলের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। ড. চৌধুরীর এই বিষয়গুলো অজানা থাকার কথা নয়। এ কারণে তিনি ব্রি বিজ্ঞানীদের ওপর ভরসা করতে পারেননি। পরিশেষে বলতে হয়, আমাদের দেশে মুড়ি ধান করতে হলে বন্যামুক্ত জমি দরকার। আর পঞ্চরীতির জন্য দরকার শীত-গ্রীষ্মের অতিরিক্ত প্রভাবমুক্ত পরিবেশ, যেখানে সারা বছর ধান করা যায়। অর্থাৎ ধান-ধান-ধান শস্যক্রমের উপযোগী উঁচু জমি। এমন জমির পরিমাণ Neat Cropped Area-এর আড়াই শতাংশেরও কম। দুই লাখ ৯ হাজার ১৫ হেক্টর মাত্র। তা দিয়ে আমাদের খাদসংকট পূরণে যা লাভ হবে, তার চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। কারণ জাতগুলোর বালাই প্রতিরোধী ক্ষমতা মোটেই টেকসই হতে পারে না। বছরজুড়ে একই জাতের মুড়ি ফসল চাষ করলে বালাই পরিষ্কৃত ক্রমাঙ্কয়ে খারাপ হতে হতে ভয়ানক আকার ধারণ করবে। আমাদের দেশ ছোট। বন্যপ্রাণ। আমাদের চাই অল্প জমিতে বেশি উৎপাদন, বেশি গ্লোটিন, বেশি কার্বোহাইড্রেট এবং বেশি পুষ্ট উপাদান। পাশাপাশি মৃত্তিকার স্বাস্থ্য রক্ষাও একটি জরুরি বিষয়। চীন বা ইন্দোনেশিয়ার মতো পরিবেশ আমাদের নেই, অচল জমিও নেই। এর চেয়ে তিন মৌসুমের (হেক্টরপ্রতি আট টন + চার টন + পাঁচ টন) উপযোগী ব্রি সম্প্রতিককালের তিনটি জাত চাষ করলে তথাকথিত পঞ্চরীতির চেয়ে বছরে হেক্টরপ্রতি তিন-চার টন ফলন বেশি পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া বালাই পরিষ্কৃত অনুকূল থাকবে। পছন্দ মোতাবেক ধানের আবাদ করা যাবে। তাই পঞ্চরীতি সামাজিক মাধ্যমের খোরাক হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের খোরাক জোগানোর জন্য আবার অনেক পথ হাঁটতে হবে।

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সাবেক নির্বাহী পরিচালক কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন

More about Kanihati Rice Series and Panchavrihi Dhan

I produced some articles in the newspapers many years back explaining why, from a scientific standpoint, rice breeding lines like Haridhan (a media hype) and Nerica (introduced from Africa) were useless to us. It makes me pleased that Haridhan and Nerica failed to make their way despite the intense promotional efforts. Likewise, I have written on the Panchavrihi and Kanihati rice breeding lines (which are not yet acknowledged as varieties) developed by Dr. Abed Chowdhury. He was highly ambitious about his Kanihati breeding lines. As a result, he decided to test those breeding lines using BADC without any involvement with BRRI. As a result, from 2017 to 2018, BADC authorities carried out two trials at their farms at Itahata during the Boro season and Subarnachar during the transplanted Aman season.

Using a subset of selected materials from these trials, they carried out an additional investigation in the 2019–20 Boro season. At the Itahata farm, yields that ranged from 7.5 to 12 tonnes per acre were remarkably high and unrealistic too. Thus, the findings of this experiment do not agree with those of the other trials. For instance, at Itahata, the yield of Kanihati-4 was 9.0 tonnes per hectare; whereas, in an experiment conducted under the supervision of BADC, the production during the Boro season was 5.5 tonnes. Kanihati-3 yielded 12 tons per hectare. It took 140 days for it to grow. However, at Subarnachar in transplanted Aman season, the same breeding line yielded just 4.2 tonnes per hectare, and the growth time was 130 days.

The yields of Kanihati-1 and Kanihati-11 per hectare at Itahata farm were 5.5 and 9.0 tonnes, respectively. The growth durations were 130 and 132 days, in that order. On the other hand, the BRRI farm yielded 5.25 tonnes and 4.14 tonnes per hectare, respectively, for Kanihati-1 and Kanihati-11, whose growth durations were 150 days or longer. Subarnachar's experimental findings are quite reasonable. The objective of the



Jiban Krishna Biswas



It is quite commendable that he is associated with the Nobel laureates. He desires to take action on behalf of his motherland's farmers. His upbringing on a farm may have shaped him greatly. But he needs to get in touch with the national organisation, BRRI, if he wants to take action on rice. However, he does not prefer to do that

experiment in Subarnachar was to find drought short-duration transplanted Aman varieties for the southern part of Bangladesh. They published their result in a journal named "Research in Agriculture, Livestock, and Fisheries" (Vol. 7, No. 3, December 2020, pp. 393–402). They are by no means short-duration breeding lines, with respect to their growth durations. The yield of the transplanted Aman on the Subarnachar farm varied from 2.6 to 4.8 tonnes per hectare. They took between 103 and 141 days to grow. On the other hand, drought-tolerant BRRI cultivars (such as BRRI dhan56 and BRRI dha57) require between 105 and 110 days to reach full maturity. Four to five tonnes per hectare rice are produced on average. Zinc-enriched BRRI dhan62 grows in 100 days and yields 4.5 tonnes per hectare. The yield of 115 days of aromatic variety BRRI dhan75 is 5.5 tonnes per hectare. In addition, there are several cultivars with growth durations of 125–135 days that yield between 5.0 and 6.0 tonnes per hectare. Only those who have minimal experience in rice research can tell where the Kanihati-breeding lines would stand in comparison to the relevant BRRI varieties. I believe that Dr. Chowdhury is not much aware of the technology established by BRRI.

Now let us return to his Panchavrihi. This rice has been the subject of a great deal of conversation on social media since last year. The majority of such conversations centre on emotion rather than science. Scientists at BRRI are not particularly engaged in this debate or discussion. However, a few have commented. The remarks do not support Dr. Chowdhury. Recently, a BRRI senior scientist posted some of his scientific justifications against his Panchavrihi on Facebook. Dr. Chowdhury said to journalist, "Somebody shared with me a Facebook post from a BRRI official who alleged that I don't talk to them. These are all nonsense that the country's largest Rice Research Institute is saying" (The Business Standard, Oct. 19, 2023). The jour-

nalist also wrote that he (Dr. Chowdhury) did not hide his anger towards the local scientists.

But scientists from BRRI-Habiganj and some scientists from the BRRI head office expressed their interest in Panchavrihi to him. He was indifferent, though. Even Dr. Shahjahan Kabir, the Director General of BRRI, has personally spoken to him a few times and asked him to provide research opportunities or deliver a seminar at BRRI. But he says he doesn't have any contact with the BRRI. However, he claims not to be in communication with the BRRI. In addition to all of this, he responds angrily to BRRI by calling it "nonsense". More so, his attitude was not beyond question. An environmentalist associated with BRRI and BARI asked him over phone, "Sir, if your Panchavrihi fails, then who will be liable for that?" Chaudhry Sa'ib angrily replied, "Why? Do you take? (কুঁড়ে কিং)"

He is unquestionably a brilliant scientist with a special talent for communicating his findings to the stakeholders. He has many scientific publications published in high impact journals of the world such as PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), Nature, and others. It is quite commendable that he is associated with the Nobel laureates. He desires to take action on behalf of his motherland's farmers. His upbringing on a farm may have shaped him greatly. But he needs to get in touch with the national organisation, BRRI, if he wants to take action on rice. However, he does not prefer to do that. What does that signify? Is he unaware that BRRI functions as a cohesive unit? BRRI scientists have also published articles in various reputed journals around the world. But they don't like self-promotion. Because, they prefer the smiling face of a farmer more than publishing a scientific article in a journal like Nature, Nature Plant, PNAS, etc.

The writer is Director General (Former), Bangladesh Rice Research Institute; Executive Director (Former), Agricultural Research Foundation